রাজনৈতিক দলের সংস্কার

অধ্যাপক গোলাম আযম

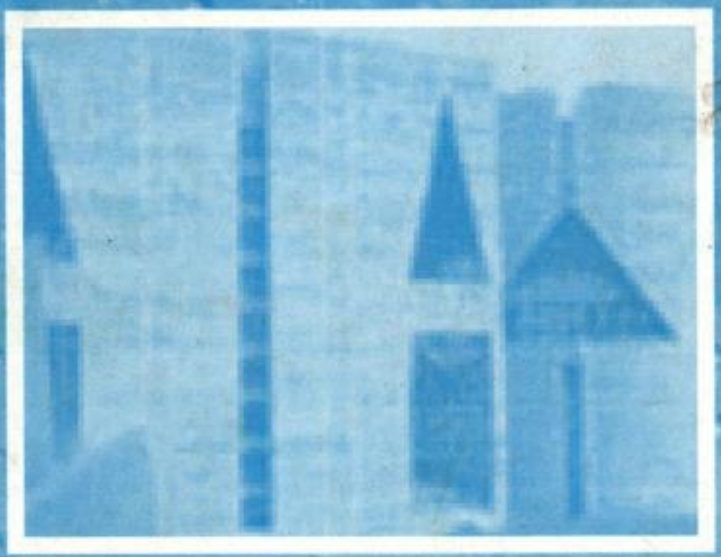

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়
বদ্বীপ প্রকাশন
৪৯১/১ ওয়্যারলেস রেলগেট, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন- ০১৭১১৫৮১২৫৫, ০১৫৫২৩২১০৩৫

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের সংস্কার
অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক
তৌহিদুর রহমান
বদ্বীপ প্রকাশন
৪৯১/১ ওয়্যারলেস রেলগেট, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন- ০১৭১১৫৮১২৫৫, ০১৫৫২৩২১০৩৫

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০০৮

কম্পিউটার কম্পোজ
তাসনিম কমপিউটার, বড়মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ
গোলাম সাকলায়েন

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ (বারো টাকা)

প্রাপ্তিস্থান
০ তাসনিয়া বই বিতান, প্রফেসর বুক কর্নার, প্রীতি প্রকাশন, আহসান পাবলিকেশন, ওয়াল্যারলেস রেলগেট, বড় বাগবাজার, ঢাকা।
০ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা।
০ আহসান পাবলিকেশন, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০ ঢাকা বুক কর্ণার, মহানগর প্রকাশনী ও তামান্না পাবলিকেশন, ৪৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
০ আজাদ বুকস ও তাজ লাইব্রেরী, আন্দর কেল্লা, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান দায়িত্ব ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা করা। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চৌদ্দ দলীয় জোটের সংস্কার আন্দোলনের কারণে ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কেয়ারটেকার সরকার নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং আরেকটি কেয়ারটেকার সরকার গঠন করেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার শেখ হাসিনার দাবিকৃত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন না করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করলে আবার লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার দু বছর ক্ষমতায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংবিধান এ সরকারকে মাত্র ৯০ দিন সময় দিয়েছে। সে হিসেবে এ সরকারকে সাংবিধানিক সরকার বলা যায় না। তবে এ সরকার সংবিধানবিরোধীও নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এ সরকারকে Extra-Constitutional বলা যায়। আগামী জাতীয় সংসদ এ সরকারের কার্যাবলিকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলে এ সরকার সংবিধানসম্মত বলে গণ্য হবে।

সংবিধান অনুযায়ী এ সরকার বৈধ না হলেও মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমর্থন ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের পৃষ্ঠপোষকতাই এ সরকারের পেছনে একমাত্র Sanction বা অনুমোদন। এ সরকার যত সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছেন এর কোনোটাই সংবিধানসম্মত নয়। তাই তাদের কার্যাবলির বৈধতা পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে পেতে হবে। সংবিধান কেয়ারটেকার সরকারকে এসব কাজের দায়িত্ব দেয়নি।

বর্তমান সরকারের মর্যাদা

কোনো রাষ্ট্র সরকারবিহীন থাকতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মর্যাদার অধিকারী না হলেও অপরিহার্য হিসেবে স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়োগ দান করেছেন। রাজনৈতিক মহল থেকেও কোনো আপত্তি করা হয়নি। প্রথমেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করায় জনসমর্থনও পেয়েছে। বিশেষ করে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে যে চরম সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে সর্বস্তরের জনগণ পরম স্বস্তি বোধ করেছে। নির্বাচন না হওয়ায় জনগণ অসন্তুষ্ট হলেও অশান্তি বন্ধ হওয়ায় সান্ত্বনা বোধ করছে।

www.pathagar.com

এ সরকারের সংস্কারমূলক কার্যাবলি

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ করেছে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে। শুধু সংস্কার নয়, পূর্ণ বিপ্লব। মানে নৈচা-কল্কে পর্যন্ত বদল করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুজন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগ দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। সরকার প্রধানের পরামর্শক্রমেই এই নিয়োগ করা হয়। খুশির বিষয় যে, প্রথমে এ নিয়োগ সম্পর্কে কোনো মহল থেকেই বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়নি।

দ্বিতীয় সংস্কারমূলক কাজ হলো দুর্নীতি দমন কমিশন পুনর্গঠন। এর চেয়ারম্যান যাঁকে করা হয়েছে তিনি পূর্ববর্তী কেয়ারটেকার সরকারের পদত্যাগকারী ৪ জন উপদেষ্টার মধ্যে একজন। সে হিসেবে বিতর্কিত ব্যক্তিই বলা যায়। তবে সাবেক সেনাপ্রধান হিসেবে তাঁর সততার সুনাম থাকায় কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যদি সত্যিই সৎ হন তাহলে চেয়ারম্যান দুর্নীতি দমনে কিছুটা হলেও সফল হতে পারেন।

এ দুটো কমিশনের কার্যক্রম কতটা সন্তোষজনক তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধিমালা সংস্কারের প্রচেষ্টায় কয়েক মাস ব্যয় করেছে অথচ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত সংগ্রহ করতে না পারায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভোটার তালিকা প্রণয়ন। চার মাস পর এর কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই এ কাজটি শুরু করলে ১৮ মাস সময়ের প্রয়োজন হতো না। এ ব্যাপারেও কমিশনের মতামতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানত বিএনপির নেতাদেরকেই টার্গেট করেছে। আওয়ামী লীগের বেশকিছু নেতাও গ্রেফতার হয়েছেন। জামায়াতেরও দু-একজন আটক হয়েছেন। ত্বরিত বিচারকার্য সমাধা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছে। এ মানের নেতাদেরকে তদন্ত শুরু করার অনেক আগেই গ্রেফতার করার কি প্রয়োজন ছিল? তারা যাতে বিদেশে গিয়ে আত্মগোপন করতে না পারেন, সে ব্যবস্থা করাই কি যথেষ্ট ছিল না? তাদেরকে জামিনে মুক্তি দিলে কি তদন্ত করা অসম্ভব হতো? মন্ত্রী ও এমপিদের মধ্যে যারা দুর্নীতি করেছেন, তাদের পক্ষে সরকারের সচিব ও কর্মকর্তাদের উদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া কি তা করা সম্ভব হতো? কিন্তু মন্ত্রী ও এমপিদের সহযোগীদের কাউকে ধরা হয়েছে বলে জানা যায় না। আর যারা গ্রেফতার হয়েছেন এদের মধ্যে যারা বিনা তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন, তাদেরকে কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? তারা যে শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করলেন এর জন্য কে দায়ী হবে?

www.pathagar.com

দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আদালতের প্রদত্ত দণ্ড ভোগ করতে তারা বাধ্য। এতে সকল নাগরিকই সরকারের এ সাফল্যে মোবারকবাদ জানাবে। কিন্তু নিরপরাধ কোনো নাগরিক যদি বিনা বিচারে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়, তাহলে আল্লাহর নিকট তা যুলুম বলেই গণ্য হবে। তাই বিচারাধীন সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। এ মানের নেতাদের দেশের ভেতরে পালিয়ে থাকার মাধ্যমে নিজেদেরকে হেয় করা স্বাভাবিক নয়। বিদেশে যাওয়ার পথ রোধ করাই যথেষ্ট।

দেশ শাসন সহজ নয়

উপদেষ্টামণ্ডলীর বেশির ভাগই আমলা হিসেবে অভিজ্ঞ। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার কথা। সাবেক পুলিশ প্রধান, সাবেক উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এ পরিষদে আছেন। প্রধান উপদেষ্টা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

ইতোপূর্বে দেশ শাসনের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন, তাদের অধীনে এসব সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেছেন। উপদেষ্টা পরিষদে শামিল হয়ে তাঁরা দু বছর দেশ শাসন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। দেশ শাসন অত্যন্ত জটিল দায়িত্ব। একটি রাজনৈতিক দলের মতো সমন্বিত টিম হওয়া তাঁদের জন্য স্বাভাবিক নয়। তাই তাঁদের পক্ষে দেশ শাসন মোটেই সহজ নয়।

এ সরকারের শাসনামলের শুরুতেই ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় গোটা অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থবির, নতুন বিনিয়োগ বন্ধ, এলসি খুলতে সাহস না পাওয়া ইত্যাদি কারণ উপদেষ্টাগণ চিহ্নিত করতে পেরেছেন কি না এবং এর প্রতিকার করতে সক্ষম হচ্ছেন কি না, তা আমাদের পক্ষে জানা কঠিন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় থাকায় গোটা দেশবাসী পেরেশান। অর্থ উপদেষ্টার এ মন্তব্য 'পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় এ বৃদ্ধি বেশি নয়' জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারবে কি? অবশ্য দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সার সংকট ও অন্যান্য কারণে ইতিমধ্যে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার থেকেও পাঁচ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছেন।

রাজনৈতিক সংস্কার

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার যত সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও জটিল বিষয় হলো রাজনৈতিক সংস্কার। এ সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা। এর কয়েকটি দিক রয়েছে।

www.pathagar.com

১. রাজনৈতিক দলসমূহের সাংগঠনিক কাঠামো, দলীয় কার্যক্রম ও আচরণে গণতান্ত্রিক নীতিমালার প্রচলন এবং দলীয় আয়-ব্যয়ের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

২. রাজনৈতিক কার্যক্রম ও তৎপরতায় রাজনৈতিক দলসমূহের গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলার ব্যবস্থা করা।

৩. অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদেরকে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য করা।

এ সংস্কারসমূহের প্রয়োজনীয়তা

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তি বা দলই উক্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে পারে না। দীর্ঘ নয় বছর সকল রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলন করে ১৯৯০ সালে সামরিক স্বৈরশাসককে পদত্যাগে বাধ্য করতে সক্ষম হয় এবং সর্বসম্মতভাবে নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও উপরিউক্ত সংস্কারের অভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালু রাখা সম্ভবপর হয়নি এবং ২০০৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠানই করা যায়নি।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ জনগণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনে তারা অত্যন্ত উৎসাহী। তাই দেশপ্রেমিক সকল মহলই আন্তরিকভাবে কামনা করে যে, আগামী নির্বাচনের পূর্বেই উপরিউক্ত সংস্কারসমূহ সম্পন্ন হোক, যাতে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও বিকাশে কোনো সংকট দেখা না দেয়।

এসব সংস্কার কারা করবে?

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার নির্বাচিত না হলেও নিরপেক্ষ, নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক। সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার না হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে জনগণ মেনে নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এ সরকার স্থিতিশীল। সরকার প্রধান হিসেবে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বিগত ১২ এপ্রিল (২০০৭) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ২০০৮ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে এ সরকারের মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। সেনাপ্রধান দেশে সামরিক শাসন হচ্ছে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এ সরকারের মেয়াদকাল ২০০৮ সালেই শেষ হয়ে যাবে। সশস্ত্র বাহিনী সরকারকে এ মেয়াদের মধ্যে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করবে।

www.pathagar.com

এ সরকারের বিকল্প কোনো সংস্থা নেই, যারা সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেবে। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি সংস্কার কার্য নিজেরাই সামধা করতে সক্ষম হতো, তাহলে দেশ বর্তমান সংকটের সম্মুখীন হতো না। বিদেশ থেকে কেউ এসে আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধান করে দেবে না। তাই এ সরকারের আমলেই নির্বাচন কমিশন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে অবশ্যই সহযোগিতা করবে। সুশীল সমাজ নামে যারা খ্যাত হয়েছেন, তাদের সাথে নির্বাচন কমিশন সংস্কার সম্পর্কে মতবিনিময় করেছে এবং বিএনপি ছাড়া বাকি প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের সাথেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সাফল্য খুব কমই অর্জিত হয়েছে।

এ সংস্কার প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে, যখন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। রাজনৈতিক দলসমূহ সংস্কারে সম্মত না হলে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে সফল হতে পারবে না। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রাজনৈতিক দলসমূহের উপর কোনো সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশন উদ্যোগ নিয়েছে আর দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করলে সফলতা অনিবার্য।

এ সরকারকে ব্যর্থ হতে দিলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ সরকার ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অপরিহার্য হতে বাধ্য। তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই আমাদের সবার স্বার্থেই বর্তমান সরকারকে সফল হতে সাহায্য করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। সাধারণত এ কথা দ্বারা বোঝানো হয় যে, সরকার যেন নির্বাচন কমিশনের উপর কোনো চাপ প্রয়োগ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোনো মহল থেকেই নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়। সরকার নির্বাচনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট ২০০৬ সালে তদানীন্তন নির্বাচন কমিশনকে মেনে নিতেই রাজি হয়নি। বর্তমান কমিশনকে মেনে নিলেও আওয়ামী লীগ বারবার চাপ প্রয়োগ করছে যে, নির্বাচন ত্বরান্বিত করতে হবে। তারাই ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ডের দাবি জানিয়েছিলেন। এর জন্য নির্বাচন কমিশন যে সময় প্রয়োজন বলে মনে করছে তা মেনে নিতে তারা প্রস্তুত নন। এভাবে চাপ প্রয়োগ করলে এ কমিশনও বিতর্কিত হয়ে পড়বে এবং ইতিমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

ভোটার তালিকা তৈরি করার পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক তোলা হয়েছে। কমিশন ১২০০ ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে এ কাজ সমাধা করতে চায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা করার কথা আইনে আছে বলে দাবি তোলা হয়েছে। কমিশন একটা আপস প্রস্তাব দিয়েছে যে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরম দিয়ে আসা হবে; কিন্তু ভোটার হওয়ার জন্য ক্যাম্পে আসতে হবে। কারণ, ফটো তোলার যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য ক্যাম্পেই সুবিধা হবে। বিশেষ করে আইডি কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রস্তুত করতে হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করা অসম্ভব। আইডি কার্ড সবার জন্য অত্যাবশ্যক। এ কার্ড ছাড়া কোন নাগরিক সুবিধাই কেউ ভোগ করতে পারবে না। এ কথা জনগণকে বোঝানো কঠিন নয় যে, ক্যাম্পে গিয়ে আইডি কার্ড না আনলে তাদের জীবন অচল হয়ে পড়বে। তাই সবাই ক্যাম্পে গিয়ে ভোটার হওয়াও জরুরি মনে করবে। ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হতে হবে। এ সময়সীমা ঠিক রেখে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া উচিত।

দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চাইলে

এ বিষয়ে কোনো মহলেরই দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দুর্নীতিপরায়ণ কোনো লোক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় এবং কালো টাকার মালিকরা টাকার জোরে রাজনৈতিক দলের নমিনেশন খরিদ করতে না পারে।

বর্তমান সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদেরকে আইনের আওতায় এনে আদালতের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যদি দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকরা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য বিবেচিত হয়ে যাবে।

এ প্রক্রিয়া ছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচন আশা করা চলে না। এ কাজটি সমাধা করার জন্যও সময় দরকার। ২০০৮ সালের শেষ দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আশা করা যায় যে, দুর্নীতি দমন কমিশন এ কাজ সমাধা করতে সক্ষম হবে। তাই যারা দুর্নীতিবাজদের প্রভাবমুক্ত নির্বাচন চান, তাদেরকে নির্বাচন ত্বরান্বিত করার দাবি ত্যাগ করতে হবে।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার

গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই কোনো এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয়ে থাকে। তাই রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান চালু রাখার দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরেই যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু না থাকে, তাহলে গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ারই প্রবল আশঙ্কা থাকে।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বিশ্বজনীন নীতিমালা নিম্নরূপ:

১. দলের এমন একটি গঠনতন্ত্র থাকতে হবে, যেখানে সর্বস্তরে দলের নেতৃত্ব, দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্থা (কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি, স্টান্ডিং কমিটি ইত্যাদি) নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হওয়ার বিধান থাকতে হবে।

২. দলের সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট সংস্থার অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে। সংস্থার সকল সদস্যের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সুযোগ থাকতে হবে।

৩. দলের সর্বস্তরে দলীয় রশিদ কেটে দলের তহবিলে অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আয় ও ব্যয়ের হিসাব অডিটযোগ্য হতে হবে। সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থায় বছরে কমপক্ষে একবার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করতে হবে, যাতে দলীয় তহবিলের ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আসেন।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার পদ্ধতি

সরকার ও নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের সংস্কার সম্পর্কে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিলে রাজনৈতিক দলসমূহ দলের নির্দিষ্ট ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাজনৈতিক দলের উপর সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। তবে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতিমালা গ্রহণ করতে কোনো দল সম্মত না হলে নির্বাচন কমিশন সে দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারবে।

ইতোমধ্যেই প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেছে যে, পরিপূর্ণভাবে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলেই তারা দলীয় ফোরামে সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গণতন্ত্রের সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন বিধি-বিধান মেনে নিতে কোনো দলেরই আপত্তি করার কথা নয়। বাস্তবে সকল নীতিমালা পালনে সকল দল সমান মানে সফল নাও হতে পারে। কিন্তু নীতিমালা অস্বীকার করা কোনো দলের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিনিময় হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আশা করা যায় পূর্ণভাবে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হলেই এ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

জামায়াতে ইসলামীতে সংস্কার

২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহের মধ্যে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম দল হলো বিএনপি, দ্বিতীয় দল আওয়ামী লীগ, তৃতীয় দল জামায়াতে ইসলামী ও চতুর্থ দল জাতীয় পার্টি। এ চারটি দলকেই প্রধান দল হিসেবে গণ্য করা হয়।

যেসব দিক দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রয়োজন বলে আলোচনা হচ্ছে, প্রধান দুটো দল তা করবে বলে ঘোষণা করেছে। একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনেই

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এমন কোনো ত্রুটি নেই, যার সংস্কার প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল কয়েকটি টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার প্রদান করে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। সংস্কারমূলক যেসব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো জন্মলগ্ন থেকেই জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে চালু রয়েছে বলে নতুন করে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক মহলের অবগতির উদ্দেশ্যে জামায়াতের গোটা সাংগঠনিক পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরিবেশন করছি :

জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতি

জামায়াতের উদ্দেশ্য হলো, 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' কায়েম করা। এটাই জামায়াতের স্লোগান। তাই জামায়াতে তারাই সংগঠনভুক্ত হন, যারা সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করেন বা সৎ হওয়ার জন্য আগ্রহী। জনসভা, সমাবেশ, সুধী বৈঠক ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে জামায়াতের ঐ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সকলকে সংগঠনভুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যারা সাড়া দেন তারা সহযোগী সদস্য হিসেবে এই সংগঠনে যোগদান করেন। সহযোগী সদস্যদেরকে সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

রাসূল (স) ১৩ বছর লোক তৈরি করার পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে আল্লাহর আইনের মাধ্যমে বর্বর আরব সমাজে আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র কায়েম করেছেন। সৎ লোক আপনা-আপনিই তৈরি হয় না, রেডিমেড পাওয়া যায় না। সৎ হওয়ার আগ্রহীদেরকে গড়ে তুলতে হয়। লোক তৈরির চার দফা কর্মসূচি স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনের ৪টি আয়াতে উল্লেখ করেছেন। জামায়াত ঐ কর্মসূচি অনুযায়ীই নিম্নরূপ পদ্ধতিতে লোক তৈরি করছে :

১. সহযোগী সদস্যদেরকে কর্মী হিসেবে সাপ্তাহিক বৈঠকে উপস্থিত হতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যারা কর্মী হিসেবে সাপ্তাহিক বৈঠকে হাজির হয় তারা সেখানে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করেন, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন ও বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করেন।

২. তারা প্রতি মাসে নিয়মিত সাধ্য পরিমাণ টাকা জামায়াতের তহবিলে দান করেন।

৩. যারা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছেন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ (রুকন) দান করা হয় এবং তারা তাদের জান ও মাল আল্লাহর পথে কুরবানি করার শপথ গ্রহণ করেন।

৪. সদস্য বা রুকন হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়-

ক. পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা অর্জন;

খ. জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফরজ ও ওয়াজিব পালন এবং হারাম বর্জন;

গ. বিশেষ করে আয়-রোজগার হালাল ও স্বচ্ছ হওয়া।

www.pathagar.com

সংগঠনের বিভিন্ন স্তর

স্থানীয় জামায়াত, ইউনিয়ন জামায়াত, উপজেলা বা থানা জামায়াত, জেলা জামায়াত ও কেন্দ্রীয় জামায়াত।

কেন্দ্রীয় জামায়াতের আমীর ও মজলিসে শূরা (কাউন্সিল), কর্মপরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) ও নির্বাহী পরিষদ তিন বছর পরপর নির্বাচিত হয়। জেলা আমীর, জেলা মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ দু বছর পরপর নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট ৩টি স্তরে প্রতি বছরেই নির্বাচন হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি

সর্বস্তরেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন নির্দিষ্ট দিনে রুকনগণকে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সমবেত করে। কমিশনার গঠনতন্ত্র থেকে ঐ ধারাটি পড়ে শোনান, যেখানে আমীর পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি তাদের মধ্যে ব্যালট পেপার বিতরণ করে গোপনে একজনের নাম লিখে ব্যালট বাক্সে তখনই জমা দিতে বলেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ তখনই ভোট গণনা করে যিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। ঐ সমাবেশেই নির্বাচিত ব্যক্তি আমীর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

আমীর পদের জন্য কেউ পদপ্রার্থী হন না। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেউ তার আচরণে পদের আকাঙ্ক্ষী বলে প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদই বাতিল হয়ে যায়। রাসূল (স)-এর হাদীসই এ বিষয়ে এত কড়াকড়ির কারণ। তিনি বলেছেন, 'যে পদ চায় তাকে আমি দিই না।'

চাকরির জন্য প্রার্থী হওয়া দূষণীয় নয়, নেতৃত্বের পদের জন্য অবশ্যই দূষণীয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ছাড়া নেতৃত্বের পদের জন্য লোভ করা স্বাভাবিক নয়।

জামায়াতে ইসলামীতে কখনো নেতৃত্বের কোন্দল হয় না; নেতৃত্বের লোভের কারণে দলে ভাঙনের আশঙ্কা থাকে না; নেতা নির্বাচনে প্রার্থিতা নেই বলে বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে জনশক্তি বিভক্ত হয় না। তাই দলীয় ঐক্য স্থায়ী থাকে।

সর্বস্তরেই মজলিসে শূরার সদস্যগণ রুকনদের গোপন ভোটে নির্বাচিত হন। সেখানেও প্রার্থিতা নেই।

কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার নির্বাচন পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় নির্বাচনে এত বিরাট সংখ্যক রুকনকে সমবেত করা বাস্তবসম্মত নয় বিধায় তা করা হয় না। এর পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক জেলা আমীরকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেন। তিনি জেলার রুকনগণকে সমবেত করে গোপন ব্যালটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ফলাফল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে পাঠান।

www.pathagar.com

২. প্রার্থিতা না থাকায় সারা দেশের রুকনদের মধ্য থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি চিহ্নিত করা অনেকের পক্ষে দুরূহ হতে পারে। তাই আমীর পদের উপযুক্ত তিন জনের একটা প্যানেল কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গোপন ভোটের মাধ্যমে বাছাই করে দেয়। ভোটাররা যেকোনো একজনকে ভোট দিতে পারেন। প্যানেলের বাইরেও অন্য যেকোনো রুকনকে ভোট দেওয়ার অধিকার গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী সকল স্তরে আমীরগণ মজলিসে শূরার পরামর্শ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য। মজলিসে শূরায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই জামায়াতের ঐতিহ্য। কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হলে অধিকাংশের মতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভিন্নমতের সবাই এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

দায়িত্বশীলদের সমালোচনার সুযোগদান

বছরে কমপক্ষে একবার সর্বস্তরে মজলিসে শূরার বৈঠকে আমীরসহ সকল দায়িত্বশীলকে জবাবদিহি করতে হয়। সর্বপ্রথম আমীর নিজেকে সমালোচনার উদ্দেশ্যে পেশ করেন। দায়িত্বশীলদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিক জীবনে আপত্তিকর কোনো কিছু লক্ষ্য করে থাকলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শালীন ভাষায় মজলিসে শূরার সদস্যগণ আপত্তি প্রকাশ করেন। দায়িত্বশীল কৈফিয়ত দেন এবং ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে অকপটে স্বীকার করেন ও সংশোধনের ওয়াদা করেন। আপত্তি প্রকাশকারী যদি ভুল বুঝে আপত্তি করে থাকেন তাহলে দায়িত্বশীল তাঁর কাজের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেন।

এ পদ্ধতি চালু থাকার কারণে কারো কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে যথার্থ ফোরাম ছাড়া আলোচনা করা হয় না। সমালোচনা ও সংশোধনের এ সুযোগ না থাকলে নিন্দা চর্চার অবকাশ থাকে এবং সংগঠনে উপদল সৃষ্টির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। নেতাদের দোষ ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের এ গঠনতান্ত্রিক ঐতিহ্য জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বচ্ছ রেখেছে। তাই কোনো নেতার একনায়কত্ব, দাপট ও স্বেচ্ছাচার এখানে চলে না।

জামায়াতের তহবিল

জামায়াতের তহবিলকে ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী 'বাইতুল মাল' বলা হয়। এর আয়ের উৎস নিম্নরূপ :

ক. জামায়াতের রুকনগণ তাদের আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৫ ভাগ প্রতি মাসে নিয়মিত দান করেন।

www.pathagar.com

খ. প্রত্যেক কর্মী সাধ্যমতো প্রতি মাসে আয়ের একাংশ দান করেন। এ ছাড়া নিয়মিত কর্মী হিসেবে কেউ গণ্য হতে পারে না।

গ. সহযোগী সদস্য ও সমর্থকগণও মাসিক কিছু দান করেন।

ঘ. জামায়াতে তালিকাভুক্ত রুকন, কর্মী ও সহযোগী সদস্যগণের মধ্যে যারা বিদেশে থাকেন তারাও নিয়মিতভাবে মাসিক দান করেন।

বাজেট পদ্ধতি

প্রতি বছরের নিয়মিত ব্যয়ের জন্য কেন্দ্র, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন শাখায় বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় বাজেটের অংক জেলা বাজেট থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অডিট পদ্ধতি

সংগঠনের সর্বস্তরে আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করার উপযোগী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। কেন্দ্রীয় অডিটর কেন্দ্র ও জেলার বাইতুল মাল অডিট করেন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে এর রিপোর্ট পেশ করেন। জেলার অডিটর উপজেলার বাইতুল মাল অডিট করেন এবং উপজেলার অডিটর ইউনিয়নের বাইতুল মাল অডিট করেন।

বিশেষ অভিযান

কেন্দ্রীয় ত্রি-বার্ষিক রুকন সম্মেলন ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশেষ অভিযান চলে। যেমন ২০০৮ সালের নির্বাচনের জন্য রুকনগণকে এক মাসের আয় দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কর্মী ও সমর্থকগণও এ জাতীয় অভিযানে সাড়া দেন।

আদর্শিক রাজনীতি বনাম ক্ষমতার রাজনীতি

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক দলসমূহের বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা অপরিহার্য। সকলের জন্যই তা প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহকে চুক্তিবদ্ধ হওয়া জরুরি এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক :

আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক রাজনীতি চাই, শুধু ক্ষমতার রাজনীতি নয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজস্ব ঘোষিত আদর্শ থাকতে হবে। দেশকে কোন্ আদর্শে দলটি গড়ে তুলতে চায় তা সুস্পষ্ট হতে হবে। ঐ আদর্শের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তোলার উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। জনগণকে ঐ আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত করে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করবে। ক্ষমতার রাজনীতি

www.pathagar.com

(Power Politics) আদর্শের ধার ধারে না। ছলে, বলে, কৌশলে কোনো রকমে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতি মোটেই গঠনমূলক হতে পারে না। রাজনীতি করার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষমতা দখল হওয়া উচিত নয়। দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ক্ষমতা অবশ্যই প্রয়োজন। ক্ষমতা মাধ্যম মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। আদর্শ প্রতিষ্ঠাই চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আদর্শিক রাজনীতি ও গদি লাভের রাজনীতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ক্ষমতার রাজনীতি যাদের আসল লক্ষ্য তারা নীতির ধার ধারে না। তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করে না। জাল ভোট দেওয়া, ব্যালট বাক্স লুট করা, ভোটকেন্দ্র জোর করে দখল করা, প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ব্যালট পেপার চুরি করা ইত্যাদি তাদের নির্বাচনী পদ্ধতি। তারা নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে এমন লোকদেরকেই প্রাধান্য দেয়, যারা অর্থবল ও জনবল প্রয়োগ করে বিজয়ী হওয়ার যোগ্য। এ জাতীয় দল ক্ষমতাসীন হলে দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, নির্যাতন ইত্যাদি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। যারা আদর্শিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী তারা তাদের আদর্শে বিশ্বাসী লোকদেরকেই দলে সংগঠিত করেন এবং অবৈধ উপায়ে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার অপচেষ্টা চালান না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

রাজনৈতিক দলসমূহ একই দেশের জন্য কাজ করছে। তাদের মধ্যে আদর্শিক পার্থক্য ও বিভিন্ন ইস্যুতে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক বৈরী মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়। অনেক সময় কোনো কোনো ইস্যুতে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে থাকে। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ এক প্লাটফরমে মিলিত হয়েও আন্দোলন করেছে। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত যুগপৎ আন্দোলন করেছে। জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে একসাথে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। রাজনৈতিক ময়দানে স্থায়ী শত্রুতা ও মিত্রতা থাকে না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোনো অনুষ্ঠানে বা উৎসবে মিলিত হলে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করেন, যদিও রাজনৈতিক ময়দানে যথেষ্ট বিরোধ থাকে।

নির্বাচনে পারস্পরিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মধ্যে যখনই দেখা-সাক্ষাৎ হয় তখন তারা বন্ধুসুলভ হাত মিলান ও হাসিমুখে সৌজন্য প্রকাশ করেন। নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকেই, বিজিত দলের নেতা বিজয়ী দলের নেতাকে সৌজন্যমূলকভাবে মুবারকবাদ জানান। এটাই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। আমাদের দেশে এ ঐতিহ্য এখনো গড়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

খেলার মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী দু দলের মধ্যে বিজয়ের উদ্দেশ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। কেউ জেতে, কেউ হারে। খেলা শেষে উভয় দলের খেলোয়াড়রা কি মারামারি করে? এ মনোভাব রাজনৈতিক অঙ্গনেও পোষণ করা উচিত। সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে থাকে তাহলে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে হানাহানি হবে না। রাজনৈতিক ময়দানে গুণ্ডামি, সন্ত্রাস ও ইতরামি চালু থাকার কারণেই ভদ্রলোকেরা এ ময়দানে আসতে ভয় পায়। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভদ্র, অশালীন ও ইতর ভাষা ব্যবহার করা হলে জনগণ তাদেরকে কেমন করে শ্রদ্ধা করবে? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়ার যোগ্য হতে হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত। জনগণের নিকট ও দেশের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আকর্ষণীয় কর্মসূচি পেশ করার প্রতিযোগিতা হলে দেশবাসীর নিকট নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন। উত্তম আদর্শ, উন্নত কর্মসূচি ও মানসম্পন্ন নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা সর্বক্ষেত্রে দেশকে অগ্রসর করবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এ জাতীয় প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে যুক্তি ও বুদ্ধির হাতিয়ারই প্রাধান্য পাবে। রাজনীতিতে সহিংসতা ও বল প্রয়োগের অবসান ঘটবে। আমরা যদি এ ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারি তাহলে জনগণ আর রাজনীতিকে ভয় পাবে না। রাজনীতি তো জনগণের কল্যাণের জন্যই। জনগণ যে রাজনীতিকে ভয় পায় তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

রাজনৈতিক তৎপরতার পদ্ধতিগত সংস্কার

সকলেই স্বীকার করেন যে, রাজনীতির উদ্দেশ্যে হলো দেশসেবা ও জনকল্যাণ। তাই রাজনৈতিক তৎপরতার পদ্ধতি এমন হওয়া কিছুতেই উচিত নয়, যার ফলে জনগণের দুর্ভোগ হয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয় ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট ও অবরোধের মতো কর্মসূচি দ্বারা সরকারকে অচল করা হলে সরকারের কোনো ক্ষতি হয় না; ক্ষতি হয় দেশের অর্থনীতির। উৎপাদন ব্যাহত হয়, দিনমজুরদেরকে বেকার থাকতে হয়, যানবাহন বন্ধ থাকায় জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে। লগি-বৈঠা-লাঠি ব্যবহার করে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। এটা জঘন্যতম হিংস্রতা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। ২৮ অক্টোবর (২০০৬) পল্টন মোড়ে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাধারীরা হিংস্র হামলা চালিয়ে যেভাবে রাজপথে পৈশাচিক নরহত্যা ও লাশের উপর নৃত্যোৎসব করেছে, তা আর যা-ই হোক রাজনীতি বলে গণ্য হতে পারে না।

www.pathagar.com

তাই রাজনৈতিক দলসমূহকে এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট, অবরোধের মতো কোনো কর্মসূচি রাজনৈতিক তৎপরতায় প্রয়োগ করা হবে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালে হরতালের কুফল দেখে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি বিরোধী দলে থাকলেও আর হরতাল করবেন না। এ ওয়াদা পালন করেননি। জোট সরকারের আমলে তিনি আগের চেয়েও অধিক হরতাল পালন করেছেন।

রাজনৈতিক দলসমূহ এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হলে নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে এসব নিষিদ্ধ করে আইন পাস করা যেতে পারে। একদিনের হরতালে কোটি কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। একদিন বন্দর বন্ধ থাকলে কোটি কোটি টাকার রফতানি বন্ধ থাকে। আর অবরোধ হলে তো দেশই অচল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমের তাগিদে আশা করি এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে সম্মত হবেন।

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদেরকে জড়িত না করা

কোনো স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যাপারে বিদেশের হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। রাজনৈতিক দলসমূহ ও এর নেতৃবৃন্দই সকল রাজনৈতিক ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। জনগণ যে দলকে নির্বাচিত করে, তাদের প্রস্তাবিত সমাধানই দেশবাসী গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হয়। অন্য কোনো দেশ রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করলে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেশ রীতিমতো অপমানবোধ করে এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

উন্নয়নশীল দেশ যেহেতু বিদেশি সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, সেহেতু বিদেশি সাহায্যকারীরা সাহায্য দেওয়ার সময় এমন সব শর্ত আরোপ করে এবং এত উপদেশ খয়রাত করে, যা স্বাধীন দেশের জন্য সম্মানজনক না হলেও উন্নয়নের প্রয়োজনে তা সহ্য করতে বাধ্য হয়। এ সুযোগে তারা রাজনৈতিক ব্যাপারেও মুরব্বিয়ানা করার অপচেষ্টা চালাতে পারে। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে অপচেষ্টা প্রতিরোধ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ, বেদনা ও চরম লজ্জার বিষয় যে, ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর শেখ হাসিনা আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে গিয়ে ধরনা দিতে লজ্জাবোধ করেননি। নির্বাচনে কারচুপি করে তাকে পরাজিত করা হয়েছে বলে তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নেতা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিদেশে গিয়ে এ জাতীয় অভিযোগ

www.pathagar.com

করেননি। জাতীয় সংসদে দুতৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী জোট সরকারকে তিনি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও তালেবান মার্কা সরকার বলে আখ্যায়িত করে এ সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য উসকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন।

তিনি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন যে, জনগণ তাকেই ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশ্যে ভোট দিয়েছে; কিন্তু নির্বাচন কমিশন, কেয়ারটেকার সরকার ও তার দল কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ষড়যন্ত্র করে তাকে পরাজিত করেছেন, তাহলে জনগণের ময়দানে এ অভিযোগ তুলে গণ-আন্দোলন করা তার কর্তব্য ছিল। জনগণ যদি সত্যিই তাকে ক্ষমতাসীন দেখতে চাইত তাহলে তার ডাকে সাড়া দিয়ে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করত।

জোট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তার ডাকে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত সাড়া না দেওয়ায় তিনি ২০০৪ সাল থেকে দীর্ঘ তিন বছর জোট সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের অপচেষ্টা চালিয়েছেন। তার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে যে, জনগণ তার ডাকে মোটেই সাড়া দেয়নি।

তার দলের নেতৃবৃন্দই বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইউরোপের রাষ্ট্রদূতদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন; এমনকি রাষ্ট্রদূতদের একটি সমিতি পর্যন্ত গড়ে ওঠে। প্রতি মঙ্গলবারে তারা কোথাও সমবেত হয়ে আওয়ামী নেতাদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতেন। Tuesday ক্লাব বা গ্রুপ নামে তাদের পরিচয় হয়। জোট সরকারের তীব্র প্রতিবাদের ফলে এ ক্লাবের তৎপরতা বন্ধ হয়।

২০০৬ সালের অক্টোবরে ২০০৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার গঠনের পর আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনীতিকগণ নির্বাচন সম্পর্কে অতি উৎসাহের সাথে তৎপরতা চালান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চেয়ে তাদেরকেই অধিক তৎপর মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সমঝোতামূলক বৈঠকের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের প্রস্তাবক্রমে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত প্যাট্রেসিয়া এ বিউটেনিস তার বাসায় আপ্যায়নের আয়োজন করেন। এক পক্ষ যথাসময়ে সেখানে হাজিরও হয়; কিন্তু বিএনপি সেখানে যেতে অসম্মত হওয়ায় ঐ বৈঠক পণ্ড হয়ে যায়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিদেশিদেরকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নাক গলানোর সুযোগ দেওয়ার ফলে বাংলাদেশ এখন বিদেশিদের রাজনৈতিক চারণভূমি।

১১ জানুয়ারি (২০০৭) জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ সরকার নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করেছে। কোনো রাজনৈতিক দল এ কমিশন সম্পর্কে আপত্তি জানায়নি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা চুপ থাকার পাত্রী নন। তিনিই যখন কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেননি তখন নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, এ কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

সশস্ত্র বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এ সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। এ সরকার ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যেসব শর্ত দিয়েছিলেন, তা পূরণ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। ফটোসহ ভোটার তালিকা, আইডি কার্ড, দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকদেরকে নির্বাচনে শরিক না করা ইত্যাদি তো তারই দাবি।

শেখ হাসিনা যদি ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বর্জন না করতেন, তাহলে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হতো না। তিনি নির্বাচন বর্জন করায় বিদেশি কূটনীতিকগণ, এমনকি স্বয়ং জাতিসংঘ ঐ নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে নির্বাচন হবে কি হবে না, তা শেখ হাসিনার মর্জির উপর নির্ভর করে। আমেরিকা ও ইউরোপ, এমনকি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল পর্যন্ত তার পক্ষে রয়েছেন।

বাংলাদেশ আসামির কাঠগড়ায়

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকগণ হরহামেশাই সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে আসন্ন নির্বাচনের আয়োজন সম্পর্কে জানতে চান। বিদেশ থেকে একের পর এক ডেলিগেশন বাংলাদেশে এসে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। ভাবখানা এমন যে, যেন তাদের তাগাদা ও মনিটরিং ছাড়া এদেশে নির্বাচন সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে না। বাংলাদেশ যেন আসামির কাঠগড়ায়। বিদেশিরা এসে বাংলাদেশকে নির্বাচন সম্পর্কে জেরা করার অধিকার রাখেন এবং বাংলাদেশ সরকার, নির্বাচন কমিশন, এমনকি সেনাপ্রধান পর্যন্ত তাদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। বাংলাদেশকে এমন লজ্জাজনক অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য শেখ হাসিনাই প্রধানত দায়ী। কবে এবং কীভাবে বাংলাদেশ এ লজ্জাজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে তা এখনই বলার উপায় নেই।

সরকার যদি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় এবং নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হয় তাহলে অনুমান করা হয়তো সম্ভব হবে যে, এদেশের রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে কি না।

রাজনীতিতে নাক গলানোর যে স্বাদ বিদেশিরা ভোগ করছে, তা আব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে তারা এ থেকে বিরত হবেন কেন? এটাই দেখার বিষয় যে, এ সুযোগ কারা অব্যাহত রাখতে চান।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার বর্তমান ভূমিকা

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনার যে বিশেষ মেজাজ গড়ে উঠেছে, তাতে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিজেকে এদেশের শাসক মনে করেন। তিনি চান, এ দেশ তার মর্জিমতো চলতে হবে। যেসব দাবির দোহাই দিয়ে তিনি বিগত নির্বাচন বানচাল করতে সক্ষম হয়েছেন, সেসব দাবি পূরণ করার জন্য তিনি বর্তমান সরকারকে সময় দিতে প্রস্তুত নন। ফটোসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রস্তুত করার জন্য নির্বাচন কমিশন ১৮ মাস প্রয়োজন বলে মনে করে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এত সময় লাগবে কেন?

নির্বাচিত সংসদের অবর্তমানে বর্তমান সরকার রাষ্ট্রপতির অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ সালের বাজেট ঘোষণা করতে বাধ্য। শেখ হাসিনা প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার আরো আগে নির্বাচন করে সংসদ বসাতে পারল না কেন? ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন তিনি হতে দিলেন না। এ সরকার ১২ জানুয়ারি ২০০৭ সালে ক্ষমতায় এসেছে। শেখ হাসিনার পেশকৃত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এ সময়ের মধ্যে কি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল বলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ দাবি করতে পারেন?

এ কথা প্রমাণিত যে, শেখ হাসিনা বিজয় নিশ্চিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। আশঙ্কা রয়েছে যে, এ সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন করতে তিনি দেবেন কি না। তিনি নির্বাচন বর্জন করতে চেয়েছেন বলে জাতিসংঘসহ গোটা বিশ্ব ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হতে দেয়নি। আবারও যদি তিনি নির্বাচন বর্জন করেন, তাহলে কী হবে সেটাই দেখার বিষয়। তিনি নির্বাচন আবার বানচাল করতে চাইলে সরকার কি ঠেকাতে পারবে? এ সরকার তার বিরুদ্ধে প্রেসনোট দিয়ে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। যার পক্ষে রয়েছে আমেরিকা, ইউরোপ ও জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল তাকে সমীহ না করে সরকারের উপায় কী? রাজনীতিতে শেখ হাসিনার এ প্রাধান্য বহাল থাকলে বিদেশি হস্তক্ষেপ বন্ধ করা অসম্ভব।

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আচরণ

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরিচালনায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা ও যোগ্যতা যাচাই করেই সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। দলীয় সরকার চাপ সৃষ্টি করে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করতে বাধ্য করলেও প্রধানত মেধার ভিত্তিতেই তারা নির্বাচিত হন। এরপর বিভাগীয় ট্রেনিং তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি করে। তাদের জন্য পাবলিক সার্ভিস রুলস লিখিত আকারে আছে, যা তাদেরকে পালন করে চলতে হয়। তারা পাবলিক সার্ভেন্ট, দলীয় সরকারের সার্ভেন্ট নয়। তারা জনগণের সেবক। কোনো মন্ত্রী বা এমপি তাদেরকে দুর্নীতি ও অন্যায় আচরণ করতে বাধ্য করতে পারেন না। বড় জোর কোনো কর্মকর্তাকে বদলি করে

www.pathagar.com

মনের ঝাল মেটাতে পারেন। যারা মন্ত্রী বা এমপির দুর্নীতিতে শরীক হতে সম্মত হয় তাদের কথা আলাদা। বরং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারাই দুর্নীতির পথ দেখায়।

সরকার পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারীরা ও এমপিগণ যদি নীতিবান হন, তাহলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাও নীতিবান হতে বাধ্য হয়। সৎ লোকের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থেই সততা অবলম্বন করতে বাধ্য হন।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্বাচনে বিজয়ী দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোর পক্ষে জনগণের ম্যানডেট প্রকাশ পায়। পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে সরকারি কর্মকর্তারা ঐ মেনিফেস্টো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। দলীয় সরকার ঐ মেনিফেস্টো বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেবে। এ ব্যাপারে যদি কেউ কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তাহলে সরকার অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা ছাড়া সরকারি কর্মচারীদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কাজে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা কারো নেই। এ ঐতিহ্য আমাদের দেশে গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, যাতে সুশাসনের মান বৃদ্ধি পায়।

সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা অত্যন্ত অপমানজনক। জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যায়িত করে কেয়ারটেকার সরকার আমলে পাইকারিভাবে সকলকে অপসারণ করা হয়। ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের কেয়ারটেকার সরকার আমলে যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়, ড. ফখরুদ্দিন আহমদের সরকার তাদেরকে অপসারণ করে। যাদেরকে বর্তমান সরকার নিয়োগ দিয়েছে তারা যে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়, এর কোনো প্রমাণ কি আছে? এভাবে সকল কর্মকর্তাকেই সন্দেহ করা হলে তাদের মর্যাদা অত্যন্ত খর্ব হয়।

এক সরকারের আমলে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে ঐ সরকারের দলীয় সমর্থক মনে করে অপসারণ করা হলে যাদেরকে নতুন সরকার নিয়োগ দেবে তারা ঐ সরকারের দলীয় সমর্থক হওয়ার অভিনয় করতে বাধ্য হবে, যাতে তাদেরকে সন্দেহ করা না হয়। এ অন্যায় প্রথার অবসান প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তাদেরকে নিরপেক্ষ মনে করতে হবে এবং চাকরি সীমা লঙ্ঘন ব্যতীত তাদেরকে শাস্তিমূলক বদলি করার কুপ্রথা বন্ধ করতে হবে।

ছাত্র-রাজনীতির সংস্কার

পাকিস্তান আন্দোলনে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনে ভোটার হিসেবে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষিত হওয়ার কারণে তারা দেশের সমস্যা সম্পর্কে

www.pathagar.com

সচেতন। যেকোনো জাতীয় সংকটে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নাগরিক হিসেবে দেশের যেকোনো ইস্যুতে মতামত প্রকাশের অধিকার তাদের অবশ্যই রয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ের উদ্দেশ্যে তারা সংগঠিত প্রচেষ্টাও চালাতে পারে। এসব বিষয়ে কারোই দ্বিমত পোষণ করা স্বাভাবিক নয়।

যে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে তা হলো, রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা চালানো সমীচীন কি না?

বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রত্যেক দল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণকে সংগঠিত করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বাচনে তাদের পছন্দের দলকে ভোটও দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এমনকি আমাদের নিকট প্রতিবেশী ভারতেও রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক সংগঠন নেই। কংগ্রেস ও বিজেপি ভারতের দেশব্যাপী প্রধান দুটো দল। ছাত্র কংগ্রেস বা ছাত্র বিজেপি নামে কোনো অঙ্গসংগঠন নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা অল্প বয়সী হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই আবেগপ্রবণ। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিযোগিতায় যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করলে শিক্ষার পরিবেশ কীভাবে ধ্বংস হয় এর তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে সকলের আছে। বিশ্বের কোথাও শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক উত্তাপে বিধ্বস্ত নয়। রাজনৈতিক সংঘর্ষে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় না। আমাদের দেশের মতো সেশনজটের কলঙ্ক কোনো দেশে নেই। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমাদের দেশে এক জঘন্য অভিশাপ।

১৯৪৪ সালে আমি ফজলুল হক মুসলিম হলের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ ক্লাসে ভর্তি হই। তখন কোনো রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন ছাত্র-অঙ্গনে সক্রিয় ছিল না। অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম ছাত্রলীগ নামে যে সংগঠন ছিল, হল ইউনিয়ন ও ডাকসু নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব ছিল না। এসব নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হতো না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দুটো প্যানেল গঠিত হতো এবং নির্বাচন চলাকালে কোনো নামে প্রচারাভিযান চলত। নির্বাচনের পর ঐ নামের অবসান হয়ে যেত।

নির্বাচনে মেধাবী ছাত্ররাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। প্রচারাভিযানে প্রার্থীদের পরিচিতিমূলক হ্যান্ডবিলে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি পরীক্ষায় কেমন সম্মানজনক অবস্থান ছিল এরই বিবরণ লেখা হতো। মেধাবী নয় এমন কোনো ডানপিটে ধরনের ছাত্রকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

দলীয় রাজনীতি শিক্ষাঙ্গন দখল করায় মেধাবী ছাত্ররা এখন হল ইউনিয়ন নির্বাচনে আর পাত্তা পায় না। রাজনৈতিক দাপট প্রদর্শনের যোগ্য নেতারাই এখন হল নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচন হলে এ জাতীয় নেতারাই প্রার্থী হয়। রাজনৈতিক উত্তাপের ভয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ইউনিয়নে বহু বছর থেকে নির্বাচনই হয় না। ডাকসু নির্বাচন তো ১৯৯০ সালের পর থেকে বন্ধ। রাজনৈতিক দলীয় ভিত্তিতে অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তারই পরিণামে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং শিক্ষাঙ্গনের স্বার্থে সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত শিক্ষাজীবনের স্বার্থে দলীয় রাজনীতির লেজুড় হিসেবে কোনো ছাত্রসংগঠন থাকা কিছুতেই উচিত নয়। এ অপরাজনীতির ফলেই হল ইউনিয়ন ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের নির্বাচন হতে পারছে না এবং ইউনিয়নের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে এককালে যেসব গুণাবলি বিকাশ লাভ করত তা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

২০০১ সালে চার দলীয় জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এ বিষয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেন যে, ছাত্রসমাজকে দলীয় রাজনীতিতে টেনে আনা মোটেই কল্যাণকর নয়। বেগম জিয়া ছাত্রদলকে একবছর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাখেন এবং এ বিষয়ে অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনার নিকট অনুরোধ জানান। কিন্তু তার নিকট থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে তিনি ছাত্রদলকে সক্রিয় হওয়ার জন্য অনুমতি দেন এবং ছাত্রদলের সভাপতি নিয়োগ করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন নয়। জামায়াত ও ছাত্রশিবির একই ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী হলেও সংগঠন হিসেবে শিবির সম্পূর্ণ পৃথক। ছাত্রশিবিরের নেতৃত্ব নির্বাচনে জামায়াতের পক্ষ থেকে সামান্য হস্তক্ষেপেরও সুযোগ নেই। শিবিরের সদস্যগণ প্রতি বছর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের সভাপতি নির্বাচন করে। তাদের কর্মতৎপরতা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদেরই নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাদের সংগঠন পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের কোনো দায়িত্ব ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর নেই। শিক্ষাঙ্গনে তারা নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট। তাদের মিটিং-মিছিলে জামায়াতের স্লোগান শোনা যায় না।

দেশবাসী আশা করে যে, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন চালু না রাখার যে প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে, তা

www.pathagar.com

সকল রাজনৈতিক দলই মেনে নেবে এবং শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক সংঘাত থেকে মুক্ত রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

শ্রমিক সংগঠনে সংস্কার

১৯ শতকের শেষদিকে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ১ মে তারিখে শ্রমিকসমাজ দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবি আদায় করতে গিয়ে পুলিশের গুলির মুখে বুক পেতে দেয়। তাদের এ আত্মত্যাগকে সারা বিশ্বের শ্রমিকসমাজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং প্রতি বছর ১ মে তারিখে 'মহান মে দিবস' পালন করে।

তখনও কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি। কার্ল মার্কসের 'শ্রমিকরাজ তত্ত্বের' ভিত্তিতে যখন কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে ওঠে, তখন তারা শ্রমিকসমাজকেই বেছে নেয়। 'কারখানার মালিকানা শ্রমিকদের হতে হবে'-এ আকর্ষণীয় শ্লোগান দিয়ে কমিউনিস্টরা শ্রমিকসমাজকে বিদ্রোহী করে তোলে। কারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের কমিউনিস্ট নেতাদেরকে তোয়াজ করতে বাধ্য হয়। মালিকদের নিকট থেকে শ্রমিকদের কিছু স্বার্থ আদায় করে কমিউনিস্ট নেতারা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকদেরকে আন্দোলনে ঠেলে দিয়ে মালিকদের নিকট থেকে মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে নেতারা বিলাসী জীবন যাপন করতে থাকে।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কমিউনিস্ট নেতাদের এ খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিকরাজ কায়েমের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। সমাজতন্ত্র এর পিতৃভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করার পর কমিউনিস্ট নেতারা এ ময়দান ত্যাগ করে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঢুকে পড়ে। শ্রমিক ময়দানে থাকাকালে জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের সামান্য প্রভাবও ছিল না। এনজিওগুলোর মাধ্যমে তারা গণভিত্তি রচনার চেষ্টা করছে।

কমিউনিস্টদের শ্রমিক ময়দান ত্যাগ করার পর প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকসমাজে দলের অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। পূর্বে শ্রমিক সংগঠনগুলো কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত। এখন তারা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাদের স্লোগানে রাজনৈতিক দাবির প্রাধান্য দেখা যায়, অথচ শ্রমিকদের অধিকারের আওয়াজ এতটা প্রবল নয়।

শ্রমিক সংগঠনের ভিত্তি হলো ট্রেড ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization-ILO) জাতিসঙ্ঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐ সনদ শ্রমিকদেরকে এ অধিকার দিয়েছে যে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করতে পারবে। Collective

www.pathagar.com

Bargaining Agency (CBA)-এর মর্যাদা লাভ করার মতো জনশক্তি যে শ্রমিক সংগঠনের আছে, এর প্রতিনিধি ত্রিপক্ষীয় কমিটির সদস্য হতে পারবে।

আন্তর্জাতিকভাবে এটা স্বীকৃত যে, শ্রমিকরা Trade Union করতে পারবে অর্থাৎ সংগঠিত হয়ে দাবি জানাতে পারবে। কিন্তু এ দাবি আদায় করতে গিয়ে যাতে মালিকপক্ষের সাথে সংঘর্ষের কারণে উৎপাদন বন্ধ না হয়ে যায়, সে জন্য সরকারের শ্রম বিভাগ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও মালিকপক্ষের সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় (Tripartite) কমিটি শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে সরকারপক্ষ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে উভয় পক্ষকে সমঝোতায় পৌঁছতে সাহায্য করবে। এ পদ্ধতিতে বিনা সংঘর্ষে শ্রমিকরা তাদের যোগ্য অধিকার লাভ করে, মালিকরাও কারখানার অস্তিত্ব রক্ষা করে যথাসাধ্য স্বার্থ ত্যাগ করতে সম্মত হয়। এ চমৎকার পদ্ধতিতে শ্রমিক-মালিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হওয়ারই কথা।

২০০৬ সালের শেষদিকে সাভার ও গাজীপুরে চরম শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিলে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা করা হয়। যেসব কারখানার মালিক ঐ চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে না তাদেরকে চাপ দেওয়ার জন্য মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ দায়িত্ব নিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যারা চুক্তি অনুযায়ী বেতন দিতে সক্ষম হবে না তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রমিকসমাজকে ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী সংগঠন করতে দিলে এবং ত্রিপক্ষীয় কমিটি যথাযথ দায়িত্ব পালন করলে শ্রমিক অঙ্গনে সংঘর্ষ হওয়া স্বাভাবিক নয়।

শ্রমিক মহলে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা বহাল রাখার প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলসমূহের অঙ্গসংগঠন হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে পৃথক সংগঠন থাকা মোটেই সমীচীন নয়। যে কারণে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকা উচিত নয়, সে একই কারণে শিল্পাঙ্গনেও শ্রকিমকদের মধ্যে অঙ্গসংগঠন থাকা অনুচিত।

২০০৭-এর জুন মাসে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদের স্বীকার করেছেন যে, ২০০৬ সালে শ্রমিক মহল অসন্তোষ ও আন্দোলনের নামে যে জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনা ঘটিয়েছিল, তা আওয়ামী লীগের উদ্যোগেই হয়েছিল। কারখানা জ্বালিয়ে দেওয়া ও লুট করায় যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, তাদের সম্পর্কে মালিকরা মন্তব্য করেছেন যে তাদের কারখানার শ্রমিকরা এসব করেনি; বহিরাগতরাই করেছে।

শ্রমিক ময়দানে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন না থাকলে এমন নাশকতামূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে পারত না। তাই দেশের স্বার্থে, উৎপাদন ও উন্নয়নের স্বার্থে, সর্বোপরি শ্রমিকদের স্বার্থেই তাদের মাঝে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন থাকা উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর এ বিষয়েও চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

❖❖❖❖

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

চিন্তার জগতে ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন

১. মনটাকে কাজ দিন- অধ্যাপক গোলাম আযম
২. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি- অধ্যাপক গোলাম আযম
৩. নবী জীবনের আদর্শ- অধ্যাপক গোলাম আযম
৪. একজন মানুষ যিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সবার জন্য প্রয়োজন- অধ্যাপক গোলাম আযম
৫. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন- অধ্যাপক গোলাম আযম
৬. দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা- অধ্যাপক গোলাম আযম
৭. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই- অধ্যাপক গোলাম আযম
৮. ইসলাম ও গণতন্ত্র- অধ্যাপক গোলাম আযম
৯. ভারতীয় আগ্রাসন ও বাঙালী মুসলমান- অধ্যাপক গোলাম আযম
১০. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন- আবদুল মান্নান তালিব
১১. সত্যের তরবারী ঝলসায়- আবদুল মান্নান তালিব
১২. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী চক্রান্ত- আসরার আলম
১৩. ইসলাম বনাম বুশ, ব্লেয়ার ও পশ্চিমা বিশ্বের মানবাধিকার- আবুল আসাদ
১৪. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান- মাসুদা সুলতানা রুমী
১৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান- মাসুদা সুলতানা রুমী
১৬. আপনি জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হবেন না কেন?- মাসুদা সুলতানা রুমী
১৭. চরমোনারের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন- মাসুদা সুলতানা রু
১৮. মহিমান্বিত তিনটি রাত- মাসুদা সুলতানা রুমী
১৯. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহতায়ালার জবাব- মাসুদা সুলতানা রুমী
২০. তাবলীগ জামায়াতের অন্তরালে- আল মেহেদী
২১. ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁসি চাই- আল মেহেদী
২২. নবী জীবনের অলৌকিক ঘটনা- আল মেহেদী
২৩. ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা- জিয়াউল হক
২৪. নাযাতের পথ- ডা. মোঃ ইদ্রিস আলী
২৫. কুরআন-হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের সহী পদ্ধতি- ডা. মোঃ ইদ্রিস আলী
২৬. ভোট কি জায়েয?- ডা. মোঃ ইদ্রিস আলী
২৭. মানবীয় মতবাদ ও ইসলাম- মোঃ আজিজুল হক
২৮. ইসলামের আহবান- ডা. মোহাম্মদ মোরশেদ আলী
২৯. ইসলামের দৃষ্টিতে জবিন-বীমা-নঈম সিদ্দিকী
৩০. তাওবা ও ইস্তেগফার- হাকেম সালেহ আহমাদ

বদ্বীপ প্রকাশন

৪৯১/১ ওয়্যারলেস [illegible] ফোন-০১৭১১৫৮১২৫৫

www.pathagar.com